OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 622 - 631
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রাঢ় বাংলার ধর্মপূজা : একটি ব্যতিক্রমী পুজো পূর্ব বর্ধমান জেলার রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম

রুদ্রনীল চোংদার
স্যাক্ট, গুসকরা মহাবিদ্যালয়
Email ID : rudranil@gushkaramahavidyalaya.ac.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rarh Bengal, composite culture, Dharmamangal Kavya, Bhakta or Bhakte, Akshay Tritiya, Buddha Purnima, Charak Puja, Baneshwar Puja.

Abstract
'Rarh' refers to two Bardhamans, two Medinipurs, Bankura, Purulia, Birbhum, Murshidabad, Hooghly and Howrah districts. In most if not every village in the region, the ancient deity is Dharma Thakura. He is known by different names in different places. Dharam Puja gained so much popularity in Bengal that several Dharmamangal Kavyas were written in Bengal during the Middle Ages. Mayura Bhatta was the first poet of Dharmamangal Kavya. Dharam Thakura is said to be part of various gods. This deity is a combination of Arya and non-Arya deities and this 'composite culture' is well observed in Rarh Bengal. But Dharma Thakura is the symbol of niranjan or emptiness and the vehicle of this Dharmaraja is horse. One such example of Dharam Puja is the Kotra Puja of Rai Ramchandrapur village under Bhatar Thana in Purba Bardhaman district. The specialty of this puja is Dhunoseba, anointment by water, bringing of bhandral and above all, 9 goats are sacrificed at once. Like the Dharam Puja of other villages, there is a legend about the origin of Dharam Puja in this village. Since there is no real material about the origin of Puja, we mainly have memory studies and folklore has to be relied upon. 8 Brahmin families served the Kotra puja in Rai Ramchandrapur and the main devotees were Adhikari (Brahmin) families. The cobbler caste – called Deyashi – are heavily involved in the rituals while the launderer (Dhopa) and Muslim community are absent from this puja. People from different regions participate in this puja and the authentic spirit of the village ceremony is maintained. A small fair is also held in this village. Most of the income of the whole year is spent by every villager to organize this event. Every family play a role in organizing the festival and there is no fault in hospitality or entertainment among them. Dharma Thakura and the Puja Pratha of Rai Ramchandrapur village centering on him is the subject of this article.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের যে সাহিত্য সম্ভার রচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যটি আবর্তিত হয়েছে রাঢ়ের গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। রাঢ় বাংলার প্রাচীন একটি জনপদ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত, মহাভাষ্য, পুরান, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যে রাঢ়ের নামটি পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় লাল বা রাল শব্দের সংস্কৃত রূপ হল 'রাঢ়', সাঁওতালি ভাষায় 'রাঢ়' এবং কোলে ভাষায় 'রৌড়' শব্দ দুটির অর্থ পাথুরে বা পাথুরে শক্ত মাটি। ভাষাতত্ত্ব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে রাঢ় অঞ্চল হল - উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিনে মেদিনীপুর পূর্বে কলকাতা হাওড়া থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়ার সাঁওতাল পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত।[১]

ধর্ম ঠাকুর হল রাঢ়ের প্রাচীন দেবতা, প্রান্ত জনের দেবতা। রাঢ়র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় এই ধর্ম ঠাকুর দেবতা। আমিরার বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত বর্ধমান জেলার নানান স্থানে তিনি নানান নামে পরিচিত। কোথাও তিনি ধর্মরাজ, কোথাও তিনি বুড়োরাজ, কোথাও তিনি দক্ষিণ রায় প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভারতের জনসাধারণের গঠনগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নেগ্রিটো, নডিক, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, মেডিটেরিয়ান, ব্রাকিসেফাল প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্টি। একারণেই ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' (a land of diversity and an ethnological museum) বলেছেন। ভারতের নেগ্রিটো জাতির পর ইন্দো-চীন থেকে ভারতে আসে অস্ট্রিকরা। এই অস্ট্রিক জাতির বিভিন্ন শাখা ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অস্ট্রিকরা নেগ্রিটো জাতির সাথে মিশে গেলে ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থায় কোল, ভিল, মুন্ডা ইত্যাদি জাতির উদ্ভব হয়।[২] অস্ট্রিকরাই হল কৃষিকাজ প্রণালীর উদগাতা। বলা যায় নব্য প্রস্তর যুগেই অস্ট্রিক জাতির জীবনধারা বিকাশ লাভ করেছিল। ঠিক রা আত্মার অস্তিত্বের বিশ্বাসী ছিল একারণেই তারা যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিল। অস্ট্রিকদের পর ভারতে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছিল। দ্রাবিড়রা অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতি হওয়ায় অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশে মিশ্র সংস্কৃতি অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল।[৩] সংস্কৃতিটি অনার্য হলেও তাদের পরিকল্পনা বা চিন্তা ভাবনা কখনোই নিম্নমানের ছিল না। মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতায় আমরা সেসব উন্নত জীবন প্রণালীর নিদর্শন দেখতে পাই।

ভারত ভূমিতে আর্যদের প্রবেশ ঘটে। আর্যদের আদি বাসস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক থাকলেও অধ্যাপক ব্যান্ডেলস্টাইনের মতামতটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তার মতে, ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের কিরঘিজের স্তেপ বা তৃণভূমি অঞ্চলে আর্যরা আদিতে বসবাস করত। এই স্থান হতে আর্যদের একটি শাখা পশ্চিমে চলে আসে। পরে এই শাখা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ইরানে অপর ভাব ভারতে প্রবেশ করে। এভাবে আবার নর্ডিক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যগোষ্ঠীর সমন্বয়ে মিশ্র সংস্কৃতি বা 'Composite Culture'-র পুনরাবির্ভাব ঘটে। বাংলাতে অনার্যদের প্রভাব বেশি থাকায় আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনেক পরবর্তীতে প্রায় মধ্যযুগের শুরুর দিকে বাংলায় তুর্কিদের আগমনের ফলে যথারীতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের কাছাকাছি চলে আসায় বর্ণসংযোগ ঘটে।[৪] উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর তুই দেবদেবীর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। আর এই সূত্রেই বাংলায় 'মঙ্গলকাব্য' বিকশিত হয়েছিল। তাই বলাবাহুল্য ধর্ম ঠাকুর বা ধর্ম পূজা আদিবাসী সমাজ থেকে উৎপত্তি হয়ে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৫]

সমগ্র রাঢ় বাংলায় কোন না কোন স্থানে ধর্ম ঠাকুর বা রাঢ়র প্রাণের ঠাকুর পুজিত হয়ে আসছে ধর্ম পূজা সাধারণত বৈশাখ/ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।আবার পূর্ব বর্ধমানের বেশিরভাগ গ্রামগুলিতে মিটিং-এর মাধ্যমে জ্বর দিনক্ষণ স্থির হয়। কেননা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে একই দিনে যাতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে পুজো বিঘ্নিত হতে না পারে এবং প্রতিবেশী গ্রামগুলি একে অপরের অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হতে পারে তার জন্য। তবে অনেক গ্রামেই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনেই ধর্ম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যাইহোক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে কোন না কোন গ্রামে ধর্ম পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ধর্ম ঠাকুরের সাথে কচ্ছপ/ কূর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব স্থানে ধরম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেইসব স্থানের মন্দিরগুলিতে কূর্মমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। 'ধর্মপূজা বিধান' কূর্মকে ধর্ম ঠাকুরের বাহনরূপে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন ধর্ম ঠাকুর গোড়ায় কূর্মদেবতা ছিলেন না তবে তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূজোয় কূর্ম দেবতার পূজা এসে মিশেছে। শুধু কূর্ম দেবতাই নয়, সূর্য দেবতা এবং জল দেবতার সাথেও ধর্ম ঠাকুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৬] 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'র প্রথম কবি হলেন ময়ূর ভট্ট। আ. ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে রূপরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচনা করেছিলেন। পর ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে রামদাস আদক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'টি লেখেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে/ সাধারণ অব্দে ঘনারাম চক্রবর্তী রচিত 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'। এই কাব্যে সমকালীন সমাজের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

অনেকে ধর্ম ঠাকুরকে সূর্য দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। ধর্ম ঠাকুর শূন্য মূর্তি সূর্যকেও বলা হয় শূন্য মূর্তি। ধর্ম ঠাকুরের কৃপালাভ করলে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হয় তেমনি সূর্য উপাসনা করলে অনুরূপ ফল লাভ করা যায়। বেশ কিছু অঞ্চলে সমীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে শালগ্রাম শিলাকে ধর্ম ঠাকুর রূপে পূজা করা হচ্ছে। শালগ্রাম শিলাকে সাধারণত আমরা নারায়ণ রূপেই পূজা করে থাকি। এইরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় ধর্ম ঠাকুরের সাথে নারায়ণ তথা বিষ্ণুর সম্পর্ক বিদ্যমান।[৭] ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংযোগ রয়েছে শিব ঠাকুরের/ মহাদেবের। শিবের গাজন আর ধর্মরাজের গাজনের বৈশিষ্ট্য একই ধরনের, পার্থক্য শুধু সময়ের। শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে আর ধর্মরাজের গাজন শুরু হয় নতুন বছরে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন থেকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম ঠাকুরের গাজনে শিব ঠাকুরকে আহ্বান করা হয়। আসলে একটা সময় শৈব ধর্ম ও শক্তি সাধনা রাঢ় বাংলায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে সাধনার সংমিশ্রণ ঘটে এবং ধর্ম পূজায় শিব ঠাকুরের নেশাশিক্ত রূপটি শুধুই প্রকাশ পেয়েছে।

আবার অনেকে ধর্ম ঠাকুরকে যমরাজের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে থাকেন। যেহেতু ধর্মরাজ ও যমরাজ দুটোতেই নামের শেষে 'রাজ' শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতে 'রাজ' নামের পরিবর্তে 'রায়' শব্দটি যুক্ত হয়েছে এবং ধর্মরাজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হয়ে আসছেন। যেমন - ধরম রায়, চাঁদ রায়, কালুরায়, মেঘ রায় শ্যামরায়, দক্ষিণ রায়, উত্তর রায়, কটারায় প্রভৃতি। আবার ধর্ম ঠাকুরের সাথে দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী প্রভৃতি লোকদেবীর সাথে ইসলাম ধর্মেরও সংস্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইসলাম ধর্মের মতই ধর্ম ঠাকুর হলেন নিরাকার বা নিরঞ্জন অর্থাৎ শুন্যতার প্রতীক। তাছাড়া ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রভাব নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের স্পর্শ করেছিল। কালের অমোঘ নিয়মে মুসলিমরা ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি ঈশ্বর-কারক শব্দগুলি বর্জন করলেও 'নিরঞ্জন' শব্দটি বর্জন করেনি। ড. সুকুমার সেনও ধর্ম ঠাকুরের পায়ে বুটপরা 'অশ্বারোহী মূর্তি'কে মুসলিম সৈনিকের সাথেই অভিন্ন বলেই মনে করেছেন।

প্রত্যেকটি হিন্দু দেবদেবীর কিছু না কিছু বাহন থেকেই থাকে। 'বাহন' অর্থাৎ যিনি বহন করে নিয়ে চলেন। ধর্ম ঠাকুরের সেরূপ বাহনই হলো ঘোড়া ও হাতি, যদিও ঘোড়ার প্রচলনই বেশি। কারণ সাধারণ মানুষেরা ধর্ম ঠাকুরকে মাটির তৈরি ঘোড়া মানত করেই থাকে। বলা যায়, রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের বাহন সাদা ঘোড়া এবং সাদা ফুল (টগর, বেলি, জুঁই, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদি) তাঁর প্রিয়। ধর্ম ঠাকুরের প্রতীক হল পাদুকা বা খড়ম। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, সাদা যোদ্ধা ঘোড়া অর্থাৎ আরবি ঘোড়া মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করত আর খড়ম বা পাদুকা হল হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীকী চিহ্ন। আবার ধর্ম ঠাকুরের সাথে হিন্দু দেবদেবীরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ধর্ম ঠাকুর হল রাঢ় অঞ্চলের এক সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দু সমাজে প্রধানত বাগদী, বাউরী, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের মানুষের প্রধান দেবতা বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে উচ্চ বর্ণের মধ্যেও ধর্ম পূজা প্রবেশ করেছে।

রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম : পূর্ব বর্ধমান জেলার রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটি কাটোয়া মহকুমার ভাতার থানার অন্তর্গত। গ্রামটির নামের উৎপত্তি নিয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৩২২১ এবং ৪৫১.৮৯ হেক্টর। গ্রামটির লোকসভা কেন্দ্র হল বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং বিধানসভা কেন্দ্র হল ভাতার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভাতার থানার মোট ১০৭টি গ্রামের যে নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে অন্যতম হল রায় রামচন্দ্রপুর গ্রাম, পিন কোড ৭১৩১২৮। গ্রামটি আসলে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটিতে জমিদার বাড়ি নীলকুঠিসহ বেশ কিছু পুরাতন শিবমন্দির রয়েছে যা মধ্যযুগের বলে মনে করা হয়। গ্রামের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই রয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবার এছাড়াও রয়েছে কায়স্থ, আগুড়ি, গোয়ালা, সদগোপ এবং নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়। গ্রামটি বর্ধমান শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার ও গুসকরা রেলস্টেশন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গুসকরা রেলস্টেশন থেকে পূর্ব দিকে টোটো বা বাসযোগে এই গ্রামে আসা যায়। রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামটি আসলে আমার পৈতৃক ভিটা। কিন্তু বর্তমানে কাজের সূত্রে এই গ্রামে আর থাকা হয় না। তা সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই ধর্ম পুজো দেখতে আমরা অভ্যস্থ। এখানকার ধর্মরায় ঠাকুর কটরায়/ কটারায় নামে পরিচিত। পুজোর বিষয়ে বেশ কিছু উৎস পাওয়া গেলেও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কথোপকথনের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ গ্রাম্য ঐতিহ্য বা অনুষ্ঠানের বিষয়টি আমাদের স্মৃতিচর্চা ও জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করতেই হয়।

ভাতার থানার এই রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের দখিন (দক্ষিণ) দুয়ারী ঘরে ধর্মরাজ ঠাকুরের অবস্থান। এখানে চারটি কূর্মাকৃতি শিলা মূর্তি অবস্থিত ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে কটা রায়, ময়না রায়, মেঘ রায় এবং পোড়া ধরম রায়। প্রধান ধর্ম ঠাকুর হলেন কটা রায়/ কটরায়। কটারায়ের আগের মূর্তিটি ছিল গোলাকার কিন্তু সেটা ১৯৮০র দশকে চুরি হয়ে যায়। প্রতিবছর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঢাক বাজনার সাথে রাত্রে বেলায় দক্ষিণ দুয়ার থেকে মূল কটরায় মন্দিরে মূর্তিটিকে নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অর্থাৎ মূল কটরায় পূজোর দিন পর্যন্ত নিত্য ভোগ নিবেদন করা হয় টানা ১২ দিন ধরে। ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয় আতপ চাল, মন্ডা, ফল, কদমা, বাতাসা ইত্যাদি। সন্ধ্যা আরতির সময় সন্ধ্যায় শীতল হিসেবে নিবেদন করা হয় দুধ, সুজি, লুচি ইত্যাদি। তবে প্রত্যেহ একই রকম ভোগ থাকেনা।

কথিত আছে বহুকাল পূর্বে এই গ্রামের মুচিপাড়ায় এক বেলতলায় ছেলেরা মাটি করতে গিয়ে প্রবালের মত প্রস্তর খন্ড দেখতে পায়। ছেলেরা একটি মিষ্টির দোকানে ওই সুন্দর পাথরটির পরিবর্তে মিষ্টান্ন দাবি করে। দোকানের ময়রা ওই পাথরের ওজন মত মিষ্টি দেওয়ার জন্য দাড়িপাল্লায় পাথরটি চড়ায় এবং দাঁড়িতে ওই পাথরের ওজন এত বেশি ছিল যে প্রচুর মিষ্টান্ন চড়িয়েও ময়রা দোকানী তার সমান ওজন করতে ব্যর্থ হন। যখন কোনোভাবেই সক্ষম হল না তখন সেই দোকানী ভিত হয়ে গ্রাম প্রধানদের কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করে। গ্রামের বরিষ্ঠ ও প্রধান ব্যক্তিরা এই ঘটনায় অবাক হয়ে যান এবং সেখানেই তারা ধর্ণা দেন।[৮] সেই ভোর রাতে প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখেন যে বিগ্রহের মধ্যে অশ্বরূঢ় এক দেবমূর্তি বহির্গত হয়ে তাদেরকে বলছেন অভিনব বলিদানে তাঁকে যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকেই নাকি এখানে অভিনব বলিদান প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রামের ধর্ম পূজা তথা কটরায় পূজার অভিনব বৈশিষ্ট্যটি হল একসাথে একচোটে নয়টি পাঁঠা বলিদান। যা আর অন্য কোন গ্রামে সচরাচর দেখা যায় না। যাইহোক এবারে মূল পুজোয় আসা যাক।

নতুন বছরের পহেলা বৈশাখের পর থেকেই অনুষ্ঠানের দামামা বেজে ওঠে। অমাবস্যার দু'দিন পরে অক্ষয় তৃতীয়া পড়ে। এর ঠিক ১২ দিন পর হয় বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমার একাদশী থেকে শুরু হয়ে যায় কটরায় উৎসব। একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও বুদ্ধ পূর্ণিমা এই পাঁচ দিন ধরে উৎসবের মরশুম চলে। বাবা কটারায়ের সেবাইত হলেন রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের আটটি ব্রাহ্মণ পরিবার যথা - মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, রায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। আর প্রধান ভক্ত হল অধিকারী পরিবার (ব্রাহ্মণ)। অধিকারী পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন গোলক অধিকারী মূলত তাঁর পরিবারের নির্দেশই পুজো সম্পন্ন হয়। বর্তমানে অধিকারী পরিবারের সদস্যেরা হলেন - দেবপ্রসাদ অধিকারী, ভবানীপ্রসাদ অধিকারী, জয়ন্ত অধিকারী, শ্রীমন্ত অধিকারী। আর বাবা কটরায়ের প্রধান দেয়াশী হল মুচি সম্প্রদায়। এদের পদবী হল দাস। বর্তমানে প্রধান দেয়াশী হলেন মঙ্গলা দাস। তিনি মূল ভাড়ালটি মুচিপাড়া থেকে বাবা কটারায়ের মূল মন্দিরে নিয়ে আসেন। একাদশী তিথি থেকেই ঢাক বাজতে থাকে। ভক্তেরা সাদা উতরি (সাদা কাপড় পরনে ও গলায়) পড়ে এবং সেই উতরি খোলা হয় কটরায় পূজোর দিন অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মহাসমারোহে গোটা গ্রামের ঢাক বাজিয়ে দক্ষিণ দুয়ার থেকে কটারায় মূর্তি থেকে মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। ঐদিন থেকে ভোক্তিসহ যিনি বলিদান করেন তিনিও মোট ১২ দিন ধরে হবিষ্যি/ হবিষ্যান্ন করেন। একাদশী তিথি থেকে পুজো শুরু হয়ে যায়। ত্রয়োদশী তিথিতে হয় ধূনোসেবা। এই দিনটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ঐদিন ভক্তরা মন্দির থেকে বানেশ্বর নিয়ে আসেন। বর্তমানে বানেশ্বর লিঙ্গটি না থাকায় একটি ঢেঁকির মতো কাঠের একটি অংশ থাকে। এই কাঠের ওপরে ত্রিশূলের মত গোটা অংশ জুড়ে ফলা থাকে, তার মধ্যে ফুল ফল ইত্যাদি আটকানো থাকে। এই প্রতীকী বানেশ্বরকে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে গ্রামের অন্যান্য মূল মন্দিরগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সন্ধ্যায় তাকে স্নান করানো হয় এবং স্নান সেরে ভক্তরা ধুনো সেবার আয়োজন করে। এখানে তিনটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়। দুটি বাঁশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশাপাশি লম্বালম্বি পুঁতে দেয়া হয় এবং আরেকটি বাঁশ ওই দুটি বাঁশের মাথায় দড়ি দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এরপর ভক্তেরা সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা বাঁশের উপর পা ঝুলিয়ে মাথা নিচে করে উল্টোদিকে ঝুলতে থাকে। নিচে জ্বলতে থাকে আগুন এবং সেখানে মাঝে মাঝে ধূনো ছিটানো হয় ফলে আগুনের শিখা আরো বেড়ে যায়। একজন ভক্তে যতক্ষণ পর্যন্ত আঁচ নিতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঝুলতে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় 'ধূনোসেবা' নামে পরিচিত। ভক্তেরা যখন ঝোলেন তখন তার পার্টিল আটকানো থাকে পাটের দড়ি দিয়ে, যাতে তিনি নিচে পড়ে না যান। এই প্রক্রিয়াটি রাত আটটা থেকে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত চলতে থাকে।

ধূনো সেবার পরের দিন অর্থাৎ চতুর্দশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় মুক্তস্নান। ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় বাবা কটারায়কে মূল মন্দির থেকে বের করে নিয়ে এসে কাঠের ঘোড়ার পীঠে চাপানো হয় গোটা গ্রাম ঘোরার উদ্দেশ্যে। কাঠের ঘোড়াটিকে গরুর গাড়ির পীঠে চাপিয়ে গ্রামের মানুষজন তাকে দড়ি দিয়ে টানতে থাকে। সারারাত ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। কাঠের ঘোড়ার পীঠে বসানো থাকে সিংহাসন যেখানে বাবা কটারায়ের অধিষ্ঠান, সেখানে সিংহাসনটিকে ধরে থাকেন বাবা কটরায়ের বর্তমানের প্রধান পুরোহিত উত্তম মজুমদার। গোটা গ্রামবাসী এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং উপস্থিত থাকে ৮টি ব্রাহ্মণ বাড়ির সবাইত আর মূল ভক্ত স্বর্গীয় গোলক অধিকারী পরিবারের বংশধরেরা। দেবপ্রসাদ অধিকারী ও ভবানীপ্রসাদ অধিকারীর নির্দেশে রাত্রি আটটার সময় সেই গরুর গাড়িটি বের করা হয় আর সারারাত ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে ভোর রাতে গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বড় পুকুরে বাবা কটরায়কে স্নান করানো হয়। ঐদিন প্রায় গোটা গ্রামবাসী জেগে থাকে এবং আনন্দে মেতে ওঠে।[৯] এরপর ভোর বেলায় বাবা কটরায়কে মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়, বাবা কটরায়কে সাত পাক ঘুরিয়ে মূল মন্দিরের গর্ভ গৃহে প্রবেশ করানো হয়। ভক্তেরা ঠিক সূর্য টার আগে আকন্দের মালা পড়ে ফল, জল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে নেন। সূর্য উঠলে আর তারা আর কিছু আহার করেন না। এই ভক্তদের মধ্যে আবার কতগুলি ভাগ আছে, যেমন বড় ভক্ত, বড় ভাঁড়াল (যিনি ভাঁড়াল নিয়ে আসেন) এবং সাধারণ ভক্ত (নতুন ভক্ত যারা ওই ১২ দিন নিয়ম নিষ্ঠা পালন করে তবে নিয়মিত নয়)।

চতুর্দশীতে মুক্তস্নানের পরদিনই পড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা অর্থাৎ সেদিনই অনুষ্ঠিত হয় মূল পূজাটি। ঐদিন সকাল থেকেই গ্রামের মানুষেরা বাবা কটারায়ের উদ্দেশ্যে পুজো দিতে থাকে, পুজো চলতে থাকে দুপুর বেলা পর্যন্ত। এর মধ্যে যিনি বড় ভাঁড়াল তিনি ভাঁড়াল আনতে যান মুচিপাড়া থেকে। গ্রামের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী মনোজ দাসের পূর্ব পুরুষরা এই ধারা বজায় রেখেছে। বড় ভাঁড়ালটি তাঁর বাড়ি থেকে মঙ্গলা দাস নিয়ে আসেন এবং সেটিকে ওখান থেকে এনে মূল কটারায়ের মন্দিরের সামনে এনে রাখা হয়। দুপুর থেকেই ওই ভাঁড়ালের মধ্যে কিছু চাল বিনা আগুনে ফুটতে থাকে। এটি একটি অভিনব দৃশ্য, এর পিছনে হয়তো কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামের মানুষ দীর্ঘকাল এই বিশ্বাস বহণ করেই চলে আসছে। বিকাল চারটে নাগাদ বাবা কটারায়ের উদ্দেশ্যে হোম শুরু হয় এবং সেই হোমেই বাবা কটরায়ের উদ্দেশ্যে পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়। প্রথমে পরে একটি পাঁঠা তারপর পরে নটি পাঁঠা। এই নটি পাঁঠাকে একসঙ্গে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে এক চোটে একসাথে বলিদান করা হয়। এরপর পাঁচটি, তিনটি করে পাঁঠা বলিদান চলতেই থাকে। এই বছর নয়টি পাঠা বলিদান করেছিলেন গ্রামেরই পুরোহিত বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ১২ দিন ধরে হবিষ্যন্ন করেন এবং ৯টি বলিদান করার পরই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বলিদান হওয়ার আগে মূল ভক্ত ভবানীপ্রসাদ অধিকারী তিনি বলি করবেন তার গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেন অধিকারী বাবুর নির্দেশই বলিদান সম্পন্ন হয়। এই বলিদান হয় বিকেল ৫টায়। এরপর প্রাচীন রীতি ও প্রথা অনুযায়ী হোমের ফোটা/ তিলক প্রত্যেক সেবাইত ও তার পরিবারদের পড়িয়ে দেন প্রধান পুরোহিত শ্রী উত্তম মজুমদার। বলিদানের পর ভক্তেরা সেবাইতদের বাড়িতে ফল জল গ্রহণ করে এবং সেদিনের মতো বাবা কটরায়ের পূজো সমাপ্ত হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিন বাবা কটরায়কে মূল মন্দির থেকে আবার কাঠের ঘোড়ায় বের করে নিয়ে আসা হয় বেলা দশটা নাগাদ। সেখান থেকে গ্রামের বাইরে (পাশের গ্রাম নূতা) পোড়া ধর্ম তলায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এখানে ধর্মমঙ্গল কাব্যের নবখণ্ড থেকে পাঁচালী গাওয়া হয় -

"ধর্ম জয় জয় পূর্বের ভানু পশ্চিম উদয় বল ভাই জয়, জয়, জয়।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরপর সেখান থেকে বার বাবা কটরায়কে নিয়ে আসা হয় গ্রামের মূল ভক্ত অধিকারী বাড়িতে। পুরাতন কটরায়ের মন্দিরটি ছিল সেটি এখনো অধিকারই বাড়ির সীমানার মধ্যেই রয়েছে। বর্তমানে তা ভগ্নপ্রায়। যাইহোক সেখানে দিনের বেলাতেই পূজাও আরতি অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে অধিকারী বাড়ির নয়টি শিব মন্দিরে বাবা কটরায়কে ঘোরানো হয়। তারপর আবার প্রাচীন প্রথা মেনে আবার কটরায় মূর্তিটিকে গ্রামের মূল মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আবার বাবা কটরায়কে সাত পাক ঘুরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার পর ২১ সের মনুই ভোগ (পরমান্ন) ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় এবং সেই ভোগ ভক্ত ও সেবাইতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর সন্ধ্যা আরতির মধ্য দিয়ে পুজোর সমাপ্ত হয়।

কটরায়পুজোতে ছোট্ট একটি মেলা বসে। লোকসমাগম ও বাড়িতে অতিথি আসা নিয়ে সংখ্যাটা নেহাতই কম হয়না। প্রতিটি বাড়ির যার যেটুকু সামর্থ্য ততটুকুই আয়োজন করতে সচেষ্ট হয়। আপ্যায়ন ও আমন্ত্রণে তাদের কোন ত্রুটি থাকে না। যাইহোক এই রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের মূল উৎসব হল ধর্ম পূজা তথা বাবা কটরায়ের পূজা। বাবা কটারায় হলেন উচ্চশ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর সমন্বয়ের প্রতীক। যেহেতু মুচিরা প্রথম কটারায়ের মূর্তিটির সন্ধান পায় তাঁরা পূজায় প্রধান দেয়াশি। বাবা কটরায়ের আবির্ভাব দিবস হল পয়লা মাঘ। যেহেতু মুচি সম্প্রদায় কটরায়ের প্রথম সন্ধান পেয়েছিল। ঐ ১লা মাঘ আবার কটনায় মন্দিরে মুচি সম্প্রদায় ঢাক বাজিয়ে পুজোর আয়োজন করে এবং বলিদানও হয়। এরপরে পুজো শেষে মূর্তিকে আবার দক্ষিণ দুয়ারে রেখে আসা হয়। আবার যথারীতি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পূনরায় মূর্তি থেকে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয়। এভাবেই প্রতি বছরের ন্যায় পুজো প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

মন্দিরে বাবা কটারায়

রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের কটারায় মূর্তি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুক্তস্নানের দিন এই কাঠের ঘোড়ার পীঠে চাপিয়ে বাবা কটরায়কে গ্রাম ঘোরানো হয়।

ধূনোসেবা ত্রয়োদশী তিথিতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলিদানের দৃশ্য, এখানে ৯টি ছাগলকে পরপর সাজানো হয়েছে।

বানেশ্বর পূজা – পাদটীকা

১। রাঢ় বঙ্গ : ভাষাবিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে 'রাঢ়' শব্দটির উৎস প্রোটো-অস্ট্রো এশিয়াটিক 'রাঢ় বা 'রাঢ়ো' শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ লাল মাটির দেশ বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকার দেশ। যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলি হল সম্পূর্ন বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার মধ্যভাগ, বাঁকুড়া জেলার পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগ ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার পশ্চিমভাগ রাঢ়ের অন্তর্গত। এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অংশ বিশেষ এবং হুগলি ও হাওড়া জেলার সামান্য অংশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

২। Composite Culture : আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পণ্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল 'অস্ট্রিক'। জাতি হিসেবে এদের বলা হত নিষাদ। এরপর বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় দ্রাবিড় জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বাঙালির জনপ্রকৃতিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। এটাই Composite Culture নামে পরিচিত। বহু বছর বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালির সংস্কৃতি হয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি।

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্য : বাংলা সাহিত্যে যে মঙ্গলকাব্যের সম্ভার রয়েছে সেখানে প্রধান মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রয়েছে মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং অন্নদামঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। এছাড়াও খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম, রুপরাম, চক্রবর্তী, শ্যাম পন্ডিত, সীতারাম দাস, রাজারাম দাস, দ্বিজ প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্য ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের উৎসব কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উৎসব। তিনিই হলেন রাঢ়ের প্রাচীন দেবতা।

৪। ভক্ত বা ভক্তে : ভক্তে হল 'ভক্ত' শব্দের মূল শব্দের অর্থ। গভীর ধর্মীয় অনুভূতি এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পন করেন। রাঢ় বঙ্গে চড়ক ও গাজন উৎসবে একধরণের ভক্ত দেখা যায়, যারা হাতে একটি বেতের লাঠি নিয়ে উৎসবের দিনগুলিতে গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের মানুষ তাদের হাতে মার খাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। ভক্তেরা পুজোর দিন গুলোতে শুধু ফল জল খেয়ে উপবাস করে। ধর্ম পুজোগুলিতে ভক্তদের বড় একটি ভূমিকা থাকে, তাদের ছাড়া এই পুজো সম্পূর্ণ হয় না। সাধারণত নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকেই ভক্তে হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়ে আছে।

৫। অক্ষয় তৃতীয়া : সংস্কৃত ভাষায়, 'অক্ষয়' (अक्षय) শব্দটি 'অবিনশ্বর, ক্ষয় নাই যাহার, সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য', 'ত্রিত্য' এবং তৃতীয়া অর্থ 'চাঁদের তৃতীয় দিন'। হিন্দু পঞ্জিকায় বসন্তের বৈশাখ মাসের 'তৃতীয় চন্দ্র দিন' এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এটি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি। এই শুভদিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম নিয়েছিলেন, এ জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

৬। বুদ্ধপূর্ণিমা : বুদ্ধ পূর্ণিমা মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ/ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই পূর্ণিমা দিবসে মহামানব বুদ্ধের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে দিনটি 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। হিন্দুদের বিশ্বাস আছে যে এই দিনে ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধ রূপে তার নবম অবতার হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবে বুদ্ধের মতো পরম অহিংস মহাপুরুষের জন্ম দিবসে রাঢ় বঙ্গে এই ধরণের অনুষ্ঠান কেন পালিত হয়? তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। আসলে বাংলা ছিল অনার্যদের কেন্দ্রস্থল সেখানে আর্যিকরণ ঘটেছিল দেরিতে। তাই সেখানে অহিংস প্রভাব খুব একটা পড়েনি। বাংলায় আর্য অনার্য সংস্কৃতির কম্পোজিট কালচার গড়ে উঠেছিল, আর সেই সংস্কৃতিরই একটি উদাহরণ হল ধর্ম ঠাকুর পূজা।

৭। চড়ক পূজা : চড়ক পুজো হল গ্রামবাংলার লোক সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পুজো পালিত হয়। নতুন বছরের প্রথম ২-৩ দিন ধরে চলে চড়ক উৎসব। জানুন গ্রাম বাংলার এই বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের মাহাত্ম্য। শোনা যায় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত উপাসক বাণ রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মহাদেবের থেকে অমরত্ব পাওয়ার জন্য বাণ রাজা নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে মহাদেবকে তুষ্ট করেন এবং ভক্তিমূলক নাচ গান করে। শোনা যায় সেই সময় থেকে এই চড়কের পুজোর শুরু। লোককথা অনুসারে ১৪৮৫ সালে রাজা সুন্দরানন্দ ঠাকুর এই পুজোর প্রচলন করেন বলে অনেকে মনে করে। সেই সময় থেকে শৈব সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষজন এই উৎসব পালন করে আসছেন।

৮। বানেশ্বর পূজা : পৌরাণিক লোকশ্রুতি অনুযায়ী, বাণ নামক এক অসুর তপস্যার মাধ্যমে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব তাঁকে বর দিতে চাইলে বাণ বলেন, রোজ রোজ শিবলিঙ্গ নির্মাণ করতে তাঁকে বেশ কষ্ট করতে হয়। তাই দেবাদিদেব স্বয়ং-ই যদি উত্তম লক্ষণযুক্ত শিবলিঙ্গ দেন। তখন শিব ১৪ কোটি উত্তম লক্ষণযুক্ত শিবলিঙ্গ বাণাসুরকে দেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 622 - 631
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাণাসুরের আরাধ্য বলে এই লিঙ্গগুলি বাণলিঙ্গ বা বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে পরিচিত। এই শিবলিঙ্গগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট। রাঢ় বাংলার বেশিরভাগ গ্রামেই মূলত চড়কের দিন বানেশ্বর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য, ‘রাঢ় বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি’, কলকাতা, নন্দিতা পাবলিশার্স, ২০২৩ পৃ. ৪১-৬৬
২. চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম ভাগ, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৩৫-৩৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, 'সাংস্কৃতিকী' (অখন্ড সংস্করণ) কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯ পৃ. ৩৬৯-৩৭৬
৪. সেন, দীনেশচন্দ্র, ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ১৯৪০, অনলাইন সংস্করণ।
৫. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৪ পৃ. ৩০-৫৫
৬. মুখোপাধ্যায়, সুজয়, ‘ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ সন্ধান ও নিরঞ্জন (ধর্ম) পূজা পদ্ধতি’, কলকাতা, বার্ণিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২৩-২৫
৭. দাঁ, সুধীর চন্দ্র, ‘বর্ধমান পরিক্রমা’, কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃ. ৩১২
৮. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, ‘বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি’, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০০০, পৃ. ৫৭৯-৫৮০
৯. মিত্র, ড. অমলেন্দু, ‘রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর’, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭২, পৃ. ২০৫
১০. মিত্র, ড. অমলেন্দু, ‘রাঢ়র সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর’, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৭২, পৃ. ২০৬